

বাঙালি মুসলিম সমাজ ও নজরুলের প্রতিক্রিয়া

জুলফিকার মতিন

এ বিষয়ে বোধকরি আর কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলা সাহিত্যের পরিসরে কাজী নজরুল ইসলাম অন্যতম প্রধান যুগপ্রবর্তক কবি। এবং আরো বলা যায়, তিনি ছিলেন এক প্রচণ্ড কবিপুরুষ- যার পরিচয় উৎকীর্ণ হয়ে আছে তাঁর বিদ্রোহী নামের পরিচয়ে। তাঁর আরো কৃতিত্ব এই যে ভাব, বিষয় ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে ইম্পোজ করতে পেরেছিলেন।

আমরা জানি, নজরুলের কাব্য প্রতিভার ফুরণ ঘটে শৈশবেই। প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮)- এ সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করে বাঙালি পল্টনে থাকার সময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাতে তাঁর লেখাও মুদ্রিত হয়। কিন্তু কবি হিসেবে তিনি বিশ্বয়কর গুরুত্ব অর্জন করেন যুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রতি অল্পকালের মধ্যেই। বস্তুতঃ তখনকার পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশ, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের অধিকার সচেতন ভারতবাসীর প্রত্যাশা, ব্রিটিশ শাসকদের নিবর্তনমূলক পদক্ষেপ, দেশব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও এ দেশীয় শিক্ষিত যুবকদের বেকারত্ব, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত এবং সমান্তরাল দুটো রাজনৈতিক আন্দোলন-অসহযোগ ও খেলাফত, ঐ সময়টার সঙ্গে যুক্ত করেছিল এক নতুন মাত্রা। নজরুলের কবিতাও মিলেমিশে গিয়েছিল তার সঙ্গে। যুগের মর্মবাণীকেই তিনি যেন বহন করছিলেন কবিতায়। এ দিকটা বিবেচনা করে অনেকেই নজরুলের এই আবির্ভাবকে তুলনা করেন 'ধূমকেতু'র সঙ্গে। এ বিষয়টাতে কবি নিজেও ছিলেন অতি সচেতন। তাঁর উক্তি থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ০৫/১০/২৯ তারিখে আজিজুল হাকিমকে লেখা এক চিঠিতে বলেনঃ

“আমি এসেছি হঠাৎ ধূমকেতুর মতো, হয়তো চোখ দাঁড়িয়ে দিয়েছি।”

তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, ধূমকেতুর মতো নজরুলের এই আবির্ভাব শুধুই লোক দেখানো স্টান্ট ছিল না। তাঁর কবিতায় মূর্ত হয়েছে পালাবদলের তাৎপর্য পূর্ণ ধ্বনি ও বাস্তব সংলগ্নতার অঙ্গীকার। এ বিষয়ে, বাংলা সাহিত্যের অন্ততঃ দুজন বিশিষ্ট কবি-সমালোচকের সাক্ষ্য নেওয়া যেতে পারে :

ক) নজরুলের ‘খেয়াপারের তরণী’ ও ‘বাদল প্রাতের শরাব’ পাঠ করে মোহিতলাল মজুমদার ‘মোসলেম ভারত’ সম্পাদককে এক পত্রে লেখেনঃ

“খেয়াপারের তরণী” কবিতায় ছন্দমূল এক হইলেও মাত্রা-বিন্যাস ও গতির বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্রোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে। ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার কাব্যে এই অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই, ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে। কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লংঘন করে নাই, এই প্রচণ্ড কবিশক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে শব্দ ও অর্পণত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় না। বিশ্বয় ভয়, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা তীষণ গম্ভীর অতিপ্রাকৃত বল্লনার সুর, শব্দবিন্যাস ও ঝংকারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

“বাদল প্রান্তের শরাব” শীর্ষক কবিতায় ইরানের পুষ্পসার ও দ্রাক্ষাসার ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। এ কবিতাটিতেও কবির ‘মস্ত’ হইবার ও ‘মস্ত’ করিবার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে।”
 খ) “বিদ্রোহী” কবিতা পড়ে বুদ্ধদেব বসুর প্রতিক্রিয়া ছিল নিম্নরূপ :
 “বিদ্রোহী” পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিকপত্রে-মনে হ’লো, এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মনপ্রাণ যা কামনা করছিলো এ যেন তাই। দেশব্যাপী উদ্দীপনার এই যেন বাণী।’

কিন্তু আবার এটাও দেখতে পাওয়া যায় যে কাব্যজীবনের প্রারম্ভ থেকেই কবি হিসেবে নজরুলের স্বীকৃতি, প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা অবিমিশ্র ছিল না। বিশেষ করে তাঁর স্বসমাজ-বাঙালি মুসলমান সমাজের স্বাতন্ত্র্যবাহী রক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িক অংশ তাঁকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। বস্তুত এই আক্রমণ কোনো নান্দনিক বিচার বিশ্লেষণের জন্য হয়নি। শৈল্পিক উৎকর্ষ অপকর্ষের কিংবা গুণাগুণ নির্ধারণের কোন তল বিন্দুমাত্র স্পর্শ না করে এই আক্রমণ পরিচালিত হয় সঙ্ঘর্ষ ধর্মাত্মকতাজনিত মূঢ়তা থেকে। শিল্পের সর্বজনীনতা যেমন এদের বিবেচনার বিষয় ছিল না, তেমনি কোনো ধারণা ছিল না সাংস্কৃতিক উপাদান ও শিল্পে এই উপাদান ব্যবহারেও তার যুগোপযোগী অর্থ আহরণ সম্পর্কে। এ কারণে নজরুলের কবিতায় হিন্দু-পুরাণের প্রয়োগ তাঁকে তাদের চোখে প্রকৃত বিধর্মীতে পরিণত করে।

কিছু উদাহরণ বোধকরি আমার এ বক্তব্যের বড়ো প্রমাণ হিসেবে কাজ করবেঃ
 ক) ১৩২৯ সালের কার্তিক মাসের “ইসলাম দর্পণ” পত্রিকায় লোকটা মুসলমান না শয়তান? এই শিরোনামে মুনশী মোহম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমেদ লেখেন :
 “এই উদ্ভাম যুবক যে ইসলামী শিক্ষা আদৌ পায় নাই তাহা ইহায় লেখার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দুয়ানী মাদ্য ইহার মগজ পরিপূর্ণ। হতভাগ্য যুবকটি, ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানের সংসর্গ কখনও লাভ করে নাই। অন্ততঃ সেটুকু লাভ করিলেও পবিত্র ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে স্থায়ী পৈশাচিক খড়্গ উত্তোলন করিত না। থাকুক তাহার লেখার যথেষ্ট শক্তি। হউক সে বিখ্যাত কবি তজ্জন্য মুসলমানের গৌরব করিবার কিছুই নাই। দুঃখের বিষয় যুবক এখনও নিজেকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতেছে।”

“ইসলাম দর্পণ” পত্রিকার ঐ একই সংখ্যায় আরো বলা হয় :

“ইসলাম দর্পণের গত আশ্বিন সংখ্যায় আমরা অমঙ্গলের অগ্রদূত “ধুমকেতু ও উহার ষেচ্ছাচারী সারথি” সম্বন্ধে একটু সমালোচনা করিয়াছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মনীতি বিবর্তিত “ধুমকেতু”কে সতর্ক ও সংযত করা। কিন্তু তাহার পর হইতেই ‘ধুমকেতু’র ধর্মদ্রোহিতা ও উহার ষেচ্ছাচারিতা এত বাড়িয়া গিয়াছে-রক্তাশ্রু ধারিণী মা’ ও ‘ভগবন্দনা’ হইতে আরম্ভ করিয়া মা ভৈঃ; ব্যোম-কেদার-ব্যোম ভোলানাথ ‘হল বলরাম স্বদে’; “বোল হরি-হরি বোল” প্রভৃতি কোফরী কালাম তাহার মুখ দিয়া অর্নগল এত অধিক পরিমাণে নির্গত হইতেছে যে আমরা বাধ্য হইয়া ভাবিয়াছিলাম, যখন হরিদাসের এরূপ উৎকট অবতারকে সমালোচনা করিয়া সংযত করিবার চেষ্টা পড়শ্রম মাত্র। সেইজন্য ঐ শ্রেণীর পদার্থ বা ঐ জাতীয় জীবের আর কোন সমালোচনা করিব না বলিয়াই হ্রি করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃ-‘ধুমকেতু’ ও উহার দুর্বিনীত সারথি এখন কেবল হিন্দু পুরাণের চর্বিত চর্বণে ক্ষান্ত না থাকিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী

বাঙালি মুসলিম সমাজ ও নজরুলের প্রতিজ্ঞা

শরাসরীয়তের উপর পর্যন্ত শয়তানী আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাই ধর্মপ্রাণ মুসলমান সমাজ চঞ্চল ও অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা 'ধূমকেতু'র ধর্মহীনতা ও উহার অনাচারী সম্পাদকের বৈচ্ছাচারিতা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রতিবাদ পাইয়াছি।”

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ধূমকেতু পত্রিকার “সারথি” বা সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং নজরুল।

খ) ১৯২৫ সালের ১৫ই জুলাই এর ‘মোসলেম জগত’ পত্রিকায় নজরুলের “ইন্দ্রপতন” কবিতা সম্পর্কে সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

“কবি নজরুল ইসলাম তরুণ কবিদের মধ্যে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া পরিচিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার কবি-প্রতিভাকে প্রশংসা করি, কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁহার যথেষ্টাচার লেখনী সঙ্কলনকে ঘৃণা না করিয়া পারি না। “ইন্দ্রপতন” ইসলাম ধর্মের প্রতি, ইসলাম ধর্মগুরু জগৎপুত্র হযরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি নজরুল বিরূপ মারাত্মক বিসদৃশ ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, আমরা দেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দকে তাহাই দেখাইব।”

“জমিলে তুমি মোহাম্মদের আগে

হে পুরুষবর

কোরানে তোমার ঘোষিত মহিমা

হতে পয়গম্বর।”

উঃ একি বৈচ্ছাচারিতা।.....নজরুল তোমায় জিজ্ঞাসা করি, কোন সাহসে তুমি এহেন অসৌরবে আদ্যার নবীর উপর বাবু প্রয়োগ করিয়াছে। ইসলামের শোণিত বিন্দুমাত্র কি তোমায় শিরায় নাই।”

ঐ একই “ইন্দ্রপতন” কবিতা সম্পর্কে “মোসলেম দর্পণ” আগষ্ট, ১৯২৫ এ বলা হয়ঃ

“উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ইন্দ্রপতন কবিতায় যে ধর্মের অবমাননাকর বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে কবি নজরুল ইসলাম সমগ্র মুসলমান সমাজের নিকট অপরাধী। যাহাতে ভবিষ্যতে তিনি সংযমী হইয়া লেখনী ধারণ করেন, অর্থাৎ ইসলামের অবমাননাকর কোন বিষয়ের উল্লেখ না করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে এক্ষণে যথোচিত শাসিত করা সমাজের পক্ষে একটা কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।....কবির ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ইসলামের এইরূপ অবমাননা করিলে খোদার গজব সত্ত্বরই নাজেল হইবে।”

গ) ১৩৩৫ সালের কার্তিক মাসের “মোহাম্মদী পত্রিকায় নাজির আহম্মেদ চৌধুরী তাঁর “এছলাম ও নজরুল ইসলাম” শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন :

“যে অসংযত বাক লেখক নিজেকে জগদীশ্বর বা রাবুল আলামীন আদ্যাহ ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ করিতে দ্বিধা না করেন, যিনি আদ্যাহকে, ‘খেলানী বিধি’ তাঁহার বৃকে পদাঘাত করার এমন অনুপম ধৃষ্টতা করিতে আনন্দ ও গৌরব অনুভব করেন-এছলামের প্রতি তাঁহার এক রতি মাসা পরিমাণ শ্রদ্ধা ভক্তি বিদ্যমান থাকিতে কোন মুসলমানই তাঁহাকে আপন বলিয়া গ্রহণ করা ত দূরে থাকুক অন্তর হইতে দিক্কার না দিয়া পারে না। এছলামের চোখে এ অপরাধ অমার্জনীয়।

সাহিত্যিকী

“সুতরাং বর্তমান যুগে তিনি যে এছলামের প্রধান শত্রু, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।”

এখন কেন এই আক্রমণ, তারও একটি ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে রয়েছে বৈ কি?

এটা সত্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মোটামুটি ভাবে বাঙালি মুসলমানদের বিকাশ পর্ব শুরু হয়। কিন্তু এই বিকাশ ছিল অবাঙালি বিশেষ করে উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের নেতৃত্বাধীন। সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) পর সৈয়দ আহমদ ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার যে সূত্রপাত ঘটান, তা এক অর্থে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমান শ্রেণীর জন্ম দেয়। অন্য অর্থে ইংরেজদের ওপর নির্ভরশীল একটি মুসলমান শ্রেণীর অবস্থান নিশ্চিত করে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ জিইয়ে রেখে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যে প্রক্রিয়া ছিল ইংরেজ শাসকদের অভীষ্ট, তাতে এই শ্রেণীটির ভূমিকাই ছিল মুখ্য। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও দ্বিজাতি তত্ত্বের বাজারজাতকরণও হয় এদেরই দ্বারা। ১৯০৫ সালে মুসলিম লীগ গঠন, ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ ও ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ বস্তুতঃ এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও দ্বিজাতি তত্ত্বের বাজারজাত করার ফলাফল।

এখন প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে কাব্যক্ষেত্রে নজরুলের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ততোদিনে মাতৃভাষা বাংলাকে অবলম্বন করে সাহিত্যচর্চার সূচনা ঘটেছে। কিন্তু তা ধর্মকেন্দ্রিক চিন্তাচেতনায় এতোই আচ্ছন্ন যে তাতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যবাদী চেহারা ফুটিয়ে তোলার জন্য উগ্রতাই প্রকাশ পাচ্ছে বেশী। বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রতিবেশী হিন্দুদের সঙ্গে আরো বৈরিতার সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রে অন্ততঃ হিন্দুদের বিরোধিতার কারণেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে বঙ্গ বিভাগ রদ করা হলো এবং এর জন্য দায়ী হিন্দুরাই, এটা ইংরেজ শাসকরা বেশ সাফল্যের সঙ্গেই মুসলমানদের বোঝাতে সমর্থ হয়েছিল। এর ফলে এখানে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী হিসেবে বাঙালি মুসলমানদের একটি অংশও সংগঠিত হয়- যা ছিল ঘোরতর হিন্দুবিদ্বেষী- পশ্চাৎপদ চিন্তাধারার অনুবর্তী ও প্রচলিত শাস্ত্রবিধানের অঙ্গ সমর্থক। মহীয়সী রোকেয়ার নারীশিক্ষা প্রচলনের কালে তারা যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে, তাদের হাতে তিনি যেভাবে নিগৃহীত হয়েছেন-- তা থেকেই এদের উন্মত্ততার একটা নজির পাওয়া যেতে পারে। একটা মজার ব্যাপার হলো, মহীয়সী রোকেয়া প্রমুখ মুসলমানদের কথা বলতে গিয়ে পরবর্তীকালের ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, তখনকার মুসলমান সমাজ ছিল ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কার ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। আসলে এ কথা বলা হয়, পরবর্তীকালে তাঁদের সমাজ মানসে গ্রহণযোগ্যতার কারণে। নইলে এখনো ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে উত্থান লক্ষ্য করা যায়, তাতে যে ধর্মান্ধতা ও যুক্তিহীনতার প্রকাশ ঘটে, তা আসলে ঐ সময়ের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতিরই ধারাবাহিক রূপ। বরং বলা যায়, উগ্রতর রূপ। নারী শিক্ষা প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করে নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও অধিকার সচেতনতার যে দিগন্ত উন্মোচন মহীয়সী রোকেয়া সেদিন করতে পেরেছিলেন, মনে হয় না আজকের দিনে

বাঙালি মুসলিম সমাজ ও নজরুলের প্রতিক্রিয়া

মৌলবাদীদের সন্ত্রাসী তৎপরতার সামনে দাঁড়িয়ে সে সুযোগ তিনি পেতেন। আরেকটি কথাও উল্লেখ করার মতো, তাহলো, কি হিন্দু কি মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই এক অংশের এই চন্ড-ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদিতার কারণে এ দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারও সূত্রপাত ঘটে প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালেই। কাজেই নজরুল যখন তাঁর অসাম্প্রদায়িক সাহিত্য নিয়ে হাজির হলেন- তার উপাদান ছিল বাঙালি হিন্দু মুসলমানের মিলিত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। হিন্দু পুরাণ ও মুসলিম ঐতিহ্য-দুটোকেই তিনি ব্যবহার করলেন কোনো ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নয় বরং ব্রতী হলেন উদার মানবিক চেতনা থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের বাণী প্রচার করতে। নজরুলের এই ভূমিকা সাধারণভাবে প্রগতিবাদী উদারনৈতিক মানুষের কাছে প্রশংসনীয় হলেও কট্টরপন্থী গোঁড়া ও স্বাতন্ত্র্যবাদী ধর্মোদ্ধারের কাছে তা প্রতিভাত হতে থাকে অনৈসলামিক বলে। সুতরাং তারা খড়্গহস্ত হয়ে পড়ে তার ওপর।

তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে অধঃপতিত ভাগ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদেরকে ধর্মীয় পরিচয়ে সংগঠিত করা এবং এই অধঃপতিত ভাগ্যের জন্য ধর্মীয় পরিচয়েই হিন্দুদেরকে দায়ী করার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপনের ব্যাপারটি তো ছিলই, অধিকন্তু এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শোষিত ও নির্যাতিত হওয়ার কার্যকারণ সম্পর্কে অবৈজ্ঞানিক বোধ। একজন হিন্দু জমিদারের চেয়ে একজন মুসলমান জমিদার যে কম অত্যাচারী ছিল না, মীর মশাররফ হোসেন তা ‘জমিদার ‘দর্পণ’ (১৮৭৩) লিখেও বোঝাতে পারেননি। কিংবা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাতে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের লাঞ্ছনার মতোই সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদের দ্বারা শ্রমজীবী মুসলমানদের নিগ্রহ ছিল একই নিয়মের অধীন-তাও উপলব্ধি করার মতো বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটেনি। যে কারণে এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক উগ্রতার প্রকাশ হতে থাকে, তা যেমন প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার মধ্য দিয়ে, তা তেমনি স্বসমাজের প্রগতিবাদী মানুষেরও বিপক্ষে। ধর্মকে মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য নয় রাজনীতির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার এক সুচতুর কৌশল থেকেই ঘটতে থাকে এই ব্যাপারগুলো।

যাহোক, সমাজের এই রোষ ও নিগ্রহকে নজরুল কি চোখে দেখেছেন, তাও উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৩৩২ সালের ২৩ অগ্রহায়ণ তারিখে আনওয়ার আহমদকে লিখিত এক পত্রে তিনি বলেনঃ

“মুসলমান সমাজ আমাকে আঘাতের পর আঘাত দিয়েছে নির্মমভাবে। তবু আমি দুঃখ করিনি বা নিরাশ হইনি। তার কারণ বাংলার অশিক্ষিত মুসলমানরা গোঁড়া এবং শিক্ষিত মুসলমানরা ঈর্ষাপরায়ণ। এ আমি একটুকুও বানিয়ে বলছি। মুসলমান সমাজ কেবলই ভুল করেছে আমার কবিতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিত্বকে অর্থাৎ নজরুল ইসলামকে জড়িয়ে। আমি মুসলমান কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের সকল বাদের এবং সকল জাতির। কবিকে হিন্দু কবি, মুসলমানের কবি ইত্যাদি বলে বিচার করতে গিয়েই এতুলের সৃষ্টি।

সাহিত্যিকী

“আমি আপাতত শুধু এটুকুই বলে রাখছি যে, আমি শরিয়তের বাণী বলিনি-আমি কবিতা লিখেছি। ধর্মের বা শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে কবিতাকে মাপতে গিয়ে ভীষণ হট্টগোল সৃষ্টি হয়। ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে কবি বা কবিতা বাঁচেও না, জন্মও লাভ করতে পারে না। তার প্রমাণ আরব দেশ। ইসলাম ধর্মের কড়াকড়ির পর আর সেখা কবি জন্মান না। এটা সত্য।”

এই চিঠির ভেতর দিয়ে নজরুল অন্ততঃপক্ষে একটি কথা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে কবি কোনো ধর্ম ও সমাজের আজ্ঞাবহ হতে পারেন না। ধর্ম ও সমাজ পরিচালিত হয় শাস্ত্র দ্বারা। আর শাস্ত্র-শাসনের সঙ্গে শিল্পের যে বিরোধ, তাহলো মৌলিক। কেননা শিল্প সৃষ্টির পেছনে ত্রিন্মাশীল থাকে শিল্পী চিন্তের স্বতঃস্ফূর্ততা আর স্বাধীনতার স্পৃহা। আর শাস্ত্রশাসিত জীবনদর্শন প্রতিমুহূর্তেই তাকে হত্যা করতে চায় গলা টিপে।

তাহাড়া, পৃথিবীতে মানুষের জন্মগ্রহণ করাটাও প্রাকৃতিক ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নয়। যে পরিবারে যে সমাজে যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, তা তার স্বভাবজাত অনুকরণ প্রভৃতি দ্বারা সে সেই পরিবারের সেই সমাজের, সেই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস-সংস্কার-ঐতিহ্য, ভাষা ও আরো আরো সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোকে আয়ত্ত করে, চর্চা করে। তার এই জন্মগ্রহণ করা কিংবা বিশ্বাস সংস্কার ভাষা ইত্যাদি আহরণ করাটা যে পূর্ব নির্ধারিত, তা ঠিক নয়। নজরুল এ বিষয়টিও যথাযথ অনুধাবন করেছিলেন। নিজের মুসলমান সমাজে জন্মগ্রহণ করার বিষয়টাকেও তিনি দেখেছেন এভাবেঃ

“যে কুলে যে সমাজে যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি।”^{১০}

ঐ একই প্রতিভাষণে নজরুল আরো বলেনঃ

“কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি ওদুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করছি, গালাগালিকে গলাগালিতে পরিণত করবার চেষ্টা করছি।”

১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যা সওগাতে প্রকাশিত প্রিন্সিপাল ইবরাহিম খাঁকে লিখিত এক পত্রে নজরুল বলেনঃ

“আমাকে মুসলিম সমাজ ‘কাফের’ খেতাবের শিরোপা দিয়েছে। তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। একে আমি অবিচার বলে কোনোদিন অভিযোগ করেছি বলেও মনে পড়ে না। তবে আমার লক্ষ্য হয়েছে এই ভেবে, কাফের আখ্যায় বিভূষিত হবার মতো বড়ো ত আমি হইনি। অথচ হাফেজ-ইখ্যাম-মনসুর প্রভৃতি মহাপুরুষদের সাথে কাফেরের পংক্তিতে উঠে গেলাম।”

তার এই কথাগুলোকে ঐ পত্রেরই অন্য এক জায়গায় বিস্তৃত করেছেন এভাবেঃ

“আমার বিদ্রোহী পড়ে যারা আমার উপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তারা যে হাফেজ, ক্বামীকে শ্রদ্ধা করেন এও আমার মনে হয় না। আমি আমার চেয়েও বিদ্রোহী মনে করি তাদেরকে। এঁরা কি

বাঙালি মুসলিম সমাজ ও নজরুলের প্রতিক্রিয়া

মনে করেন হিন্দু দেবদেবীর নাম নিলেই সে কাফের হয়ে যায়। তাহলে মুসলমান কবি দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি কোনোকালেই হবে না-জৈঠনের পুঁথি ছাড়া।”

ঐ পত্রে নজরুল আরো বলেন :

“আবার বলি, যারা মনে করেন আমি ইসলামের বিরুদ্ধবাদী বা তার সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি, তারা অনর্থক এ ভুল করেন। ইসলামের নামে যে কুসংস্কার মিথ্যা আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে-তাকে ইসলাম বলে না মানা কি ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান?”

বস্তুতঃ ইসলামের নামে যে কুসংস্কার মিথ্যা আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে--তার বিরুদ্ধে লেখার জন্যই তৎকালীন ধর্মাত্মক মৌলবাদী সমাজ তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। হিন্দু সমাজের লেখকদের সঙ্গে তুলনা করে ঐ তিনি পত্রেই লেখেনঃ

“হিন্দু লেখকগণ তাঁদের সমাজের গলদ-ক্রটি-কুসংস্কার নিয়ে কি না কশাঘাত করেছেন; তা সত্ত্বেও তাঁরা সমাজের শ্রদ্ধা হারাননি। কিন্তু এ হতভাগ্য মুসলমানদের দোষ ক্রটির কথা পর্যন্ত বলার উপায় নেই। সংস্কার তো দূরের কথা। তার সংশোধন করতে চাইলেও এরা তার বিকৃত অর্থ ধরে নিয়ে লেখককে হয়ত ছুরিই মেরে বসবে। আজ হিন্দু জাতি যে এক নবতম বীর্যবান জাতিতে পরিণত হয়ে চলেছে, তার কারণ তাদের অসম সাহসিক সাহিত্যিকদের তীক্ষ্ণ লেখা।”

বলা বাহুল্য, সংস্কারের দ্বারা-সংশোধনের দ্বারা নজরুল সমাজ-প্রগতির এই বিষয়টাকে যেভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ইংরেজী ভাষা বাহিত পাশ্চাত্য শিক্ষার ভেতর দিয়ে যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন জগৎ সম্পর্কে যে ব্যাশনালিষ্টিক অ্যাপোচ হিন্দু সমাজের মধ্যে গড়ে উঠেছিল, তাই তাকে প্রচলিত প্রথা, আচার ও সংস্কারের বিপরীতে আধুনিক যুগোপযোগী পরিবর্তিত রূপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। হিন্দু সমাজের সৃষ্টিশীল ও মননশীল লেখকরা নির্মমভাবে প্রচলিত শাস্ত্র শাসিত প্রথা সংস্কার ও আচারের অমানবিকতা, অযৌক্তিকতা ও অসারত্বের প্রেক্ষিতগুলো উন্মোচন করতে থাকেন। তাঁদের রক্ষণশীল সমাজ এ জন্য খড়গহস্ত হয়েছিলো সন্দেহ নেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হতে থাকে তাঁদেরই। সতীদাহ প্রথা নিবারণ কিংবা বিধবা বিবাহ প্রচলনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। কিন্তু মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রে অবস্থাটা দাঁড়ায় সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করার পর তাদের মাথা থেকে বের হয় দ্বিজাতিতত্ত্ব। যার ভেতর দিয়ে নিজেদের ধর্মীয় রক্ষণশীলতা রক্ষা করাটাই রূপ নেয় প্রধান রাজনৈতিক ইস্যুতে। সে ক্ষেত্রে ধর্ম ও সমাজের যে কোনো শাস্ত্রীয় বিধানের যৌক্তিকতা নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করাটাও হয়ে দাঁড়ায় ধর্মের পবিত্রতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত বলে। ধর্মীয় পরিচয়ের সঙ্কীর্ণতার উর্দে উঠে সর্বমানবিক চেতনা আহরণের বিষয়টিও প্রতিভাত হয় ধর্মের মৌলিক আদর্শের বিরোধী বলে। সুতরাং এ রকম একটি সমাজের হাতে নজরুলের লাঞ্ছনা তো খুবই স্বাভাবিক।

প্রিন্সিপাল ইবরাহিম খাঁর কাছে লেখা পত্রে অবশ্য তিনি কেবল অসম সাহসী হিন্দু লেখকদের স্বসমাজে গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টিই উল্লেখ করেননি, তাঁর নিজের সম্পর্কে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনোভাবের কথাটাও ব্যক্ত করেছেন খুব ভালো করে। তিনি বলেছেন :

সাহিত্যিকী

“হিন্দু লেখক-অলেখক জনসাধারণ মিলে যে নিবিড় ঐতিহ্য ভালোবাসা দিয়ে আমায় এত বড়ো করে তুলেছেন, তাঁদের সে স্বার্থকে অস্বীকার যদি আজ করি, তাহলে আমার শরীরে মানুষের রক্ত আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। অবশ্য কয়েকজন লোংরা হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখক ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে আমায় কিছুদিন হতে ইতর ভাষায় গালাগালি করছেন, এবং কয়েকজন গোড়া ‘হিন্দু সভাওয়ালা’ আমার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনা করে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু এদেরকে আঙুল দিয়ে গোনা যায়। এঁদের আক্কেশ সম্পূর্ণ সম্প্রদায় ও ব্যক্তিগত। এদের অবিচারের জন্য সমস্ত হিন্দু সমাজকে দোষ দেই নাই এবং দিবও না। তাছাড়া আজকের সাম্প্রদায়িক মাতলামির দিনে আমি যে মুসলমান এইটেই হয়ে পড়েছি অনেক হিন্দুর কাছে অপরাধ--আমি যত বেশী অসম্প্রদায়িক হই না কেন?”

তবে স্বসমাজের তরুণদের কাছ থেকে যে উষ্ণ অভ্যর্থনা তিনি পেয়েছেন, তার স্বীকারোক্তিও নজরুল উক্ত পত্রে করেছেন অবপট চিত্তে। কিন্তু তিনি এ কথাও বলেছেন যে,

“অবশ্য এ তরুণের জাত ছিল না। এরা ছিল সকল জাতির।”

যাহোক, বাঙালি মুসলিম সমাজের এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি নজরুল তাঁর স্বসমাজ অর্থাৎ বাঙালি মুসলিম সমাজকে কোন দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাও একটি বিবেচনাযোগ্য বিষয়। একজন কমিটেড শিল্পী- একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে তাঁর এই পর্যবেক্ষণ অবশ্যই মূল্যবান। এর ভেতর দিয়ে তৎকালীন মুসলিম বাঙালি সমাজের অন্ধকারচ্ছন্নতা ধর্মাত্মতা অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কারচ্ছন্নতা পশ্চাৎমুখিতা ও এগুলো থেকে উপজাত অন্যান্য ক্রটি-বিচ্যুতি গলদ সনাক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর পরিপক্বতা বিষয়ে অবহিত হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি এসব দূরীকরণের জন্য তাঁর যে চিন্তা, তার সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ ও স্থাপন করা যেতে পারে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রথমেই বলা যায়, নজরুলের দৃষ্টিতে তাঁর সমকালীন বাঙালি মুসলিম সমাজ ছিল গোড়া ও কুসংস্কারচ্ছন্ন। ১৯৩২ সালের ৫ ও ৬ নভেম্বরে সিরাজগঞ্জের পল্লী ভবনে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন :

“আমাদের বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যে গোড়ামি ও কুসংস্কার, তাহা পৃথিবীর আর কোনো দেশে কোনো মুসলমানদের মধ্যে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যাক্তি হইবে না। আমাদের সমাজের যেসব মৌলানা সাহেবান খাল কসটিয়ে বেনোজলে আনিয়াছিলেন, তাহারা যদি ভবিষ্যদ্বাণী হইতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন বেনোজলের সাপ সাথে পুতুরের জলও সব বাহির হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু সেই খাল বাহিয়া কুসংস্কারের অজস্র কুমীর আসিয়া ভিড় করিয়াছে। মৌলানা মৌলবী সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাও চক্ষু কর্ণ বুজিয়া সহিতে পারি, কিন্তু কাঠ মোল্লার শাস্তাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।”

বাঙালি মুসলিম সমাজ ও নজরুলের প্রতিক্রিয়া

যেটি উল্লেখ করবার বিষয় তাহলো, তৎকালীন বাঙালি মুসলিম সমাজে মৌলভী-মৌলানা-মোল্লা নামধারী ব্যক্তিদেরকেই শাস্ত্রজ্ঞরূপে বিবেচনা করা হতো। ধর্মের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তারা নিজেরাও নিজেদেরকে এক একটা অথরিটি বলে জ্ঞান করতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধ থেকে মুসলিম পরিচালিত যেসব পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে, তার অধিকাংশই ছিল এদেরই দখলে। বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। লিখিত হরফের বাইরে চক্ষুকে প্রসারিত করার ক্ষমতা এদের প্রায় ছিল না বললেই চলে। এদের আচরিত ব্যাখ্যাত ধর্মকেই এরা ইসলাম ধর্ম বলে সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিল। এই জিনিসটাকে নজরুল তাঁর “হিন্দু মুসলমানদের সমস্যা” প্রবন্ধটিতে মোল্লাত্ব বলে উল্লেখ করেছেন। টুপি ও দাড়ি যে বাঙালি মুসলিম সমাজে মুসলমানত্বের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা বলা যায় এই শ্রেণীর মানুষদেরই একটা বড়ো অবদান। এ জন্যই সিরাজগঞ্জের উক্ত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে আরো পরিস্কার করে বলেন যেঃ

“চোপা চাপকান দাড়ি-টুপি দিয়া মুসলমান মাপিবার দিন চলিয়া গিয়াছে।”

চোপাচাপকান দাড়ি-টুপি ইত্যাদির দ্বারা ধর্মের যে প্রতীকী উপস্থাপনা ও প্রদর্শনের বাড়াবাড়ি, নজরুলের মতে তা একদিকে যেমন ধর্মের সত্য-সুন্দর-সার্বজনীনতাকে নষ্ট করেছে, অন্যদিকে তেমনি তা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক হানাহানির পথকে করেছে প্রশস্ত। একেই তিনি বলেছেন “মোল্লাত্ব”। সন্দেহ নেই, এই মোল্লাত্বের অভিশাপ থেকেই জন্ম নিয়েছে ধর্মীয় গোঁড়ামি আর কুসংস্কার। তাই বোধকরি এদের সম্পর্কে কঠোরতর ভাষা তিনি প্রয়োগ করেন এভাবেঃ

“এদের খেলবার ভিতরে, এদের চোপা-চাপকানের অন্তরে যাদের অন্তর্দৃষ্টি যায়, তারা দেখবেন-এরা সুদখোর কাবুলীর চেয়েও ভীষণ-দৈত্যের চেয়েও ভয়ঙ্কর। কাবুলী সুদ পেলে রেহাই দেয়, এরা সুদেমূলে সাবাড় করতে চায়।”

তদুপরি বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যে নানা বিভেদ রয়েছে, তাও নজরুলের মতে সার্বিক ঐক্য স্থাপনের পরিপন্থী। ১৯৪৩ সালে ফরিদপুরে জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণে এ সম্পর্কে বলেন,

“দেয়ালের পর দেয়াল তুলে আমরা ভেদ-বিভেদের জিন্দান খানার সৃষ্টি করেছি। কত তার নাম শিয়া, সুন্নী, শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, হানাক্কা, শাক্কা, হাম্কা মালেক্কা, লা মজহাবী, ওহাবী ও আরো বক্তজন।”

এখানে নজরুল যেসব বিভেদের উল্লেখ করেছেন, তার অধিকাংশই আসলে শাস্ত্র বিচারেরই ফলাফল। কালে কালে ইসলাম ধর্ম ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে নতুন মতের সৃষ্টি হয়েছে, তাই জন্ম দিয়েছে নতুন দলের। একদল প্রচলিত বিধি বিধানকে আঁকড়ে থেকেছে অন্যরা সরে এসেছে সেখান থেকে। এইভাবে দেখি ধর্মের ঐশ্বরিক বাণীর কেবল বদলই হয়নি, মানুষে মানুষেও তা সৃষ্টি করেছে ব্যবধান। প্রশস্ত করেছে হানাহানির পথ। এজন্যই রুঝি নজরুল বলেছেন, “পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর, বিধির বিধান সত্য হোক।”

সাহিত্যিকী

সন্দেহ নেই বাঙালি মুসলিম সমাজের উন্নতি ও প্রগতির পথে ধর্মান্ধতা গোড়ামি, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, অতীতমুখিতা কিংবা গুচ্ছ শাস্ত্রীয় বিধান পালনের ক্ষেত্রে কঠোরতা এ সবগুলোকে নজরুল মৌলিক প্রতিবন্ধকতা বলে বিবেচনা করেছেন। আর উপরোক্ত কারণগুলো থেকেই সমাজে সৃষ্টি হয়েছে আরেকটি প্রথা যা নারীকে পরিণত করেছে পুরুষতান্ত্রিক সংসারের এক নিকৃষ্টতম ভারবাহী জীব। এটা অবরোধ বা পর্দাপ্রথা। বহুত এই অবরোধ বা পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে এবং নারী মুক্তির স্বপক্ষে নজরুল ছিলেন সোচ্চারঃ

“আমাদের পক্ষে মোস্তাফা যদি হন বিদ্রোহ, তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল। আমাদের দুয়ারের সমানে এই ছেঁড়া চট করে উঠিবে খোদা জানেন। আমাদের বাংলাদেশের স্বল্প শিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে। তাহাকে একবারে স্বাস্রোধ বলা যাইতে পারে। এই জুজুবুড়ির বালাই শুধু পুরুষদের নয় মেয়েদেরও যেভাবে পাইয়া বসিয়াছে তাহাতে ইহাকে তাড়াইতে বহু সরিয়া পোড়া ও পোয়ার দরকার হইবে। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোকই চাবুরে। ‘কাঙেই খরচের সঙ্গে জমার অঙ্ক তাল সামলাতেই পারে না অথচ ইহাদেরই পর্দার ফখর সর্বাপেক্ষা বেশী। আর ইহাদের বাড়ীতে শতকরা আশিজন মেয়ে যক্ষ্মায় ভুগিয়া মরিতেছে আলো বায়ুর অভাবে। এইসব যক্ষ্মা রোগগ্রস্থ জনীর পেটে স্বাস্থ্যসুন্দর প্রতিভাদীপ্ত, বীর সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে কি করিয়া? ফাঁসীর কয়েদীদেরও এইসব হতভাগিনীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা আছে।”

এ থেকে বোঝা যায়, সমাজের অগ্রসরমান জীবন চেতনা বিকাশের প্রয়োজনে নারীর স্বাধীনতা অত্যাবশ্যকীয় ছিল নজরুলের কাছে। কেননা জীবনের যে অভিব্যক্তি তা প্রবাহিত হয় নর ও নারীর সম্মিলিত সাধনায়। এ ক্ষেত্রে নারীকে যদি অজ্ঞানতা ও মুর্থতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখা যায় কিংবা তাদের স্বাধীন ভূমিকা যদি নিশ্চিত না করা যায় তবে সামাজিক অগ্রগতির আশা দুরাশা মাত্র। এই বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের যে উদাহরণ রয়েছে, তাও তাই বলে। সেখানে ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখা যায়, সমাজ সংস্কার আন্দোলনে তীব্রতা এসেছিল নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন থেকে। রামমোহন রায় কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মনীষীরা মনোযোগ দিয়েছিলেন এদিকে। সতীদাহ প্রথা কিংবা বিবাহ প্রচলনের মতো সামাজিক আন্দোলনগুলোও তাই প্রমাণ করে। রামমোহন কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরা ছিলেন প্রগতির পথিক। কিন্তু রাধাকান্ত দেবের মতো রক্ষণশীল ব্যক্তিরও নারী শিক্ষার উপর আরোপ করেছিলেন যথোচিত গুরুত্ব।

এখানে একটি কথা স্মর্তব্য যে নারীর ভূমিকা, অধিকার ও দায়িত্ব পালনের বিষয়টি ইসলামে নির্দিষ্টভাবে বলা আছে। ধর্মীয় দিক বিবেচনা করলে তার বাইরে কোনো কিছু করার খুব একটা সুযোগ নেই। তবুও পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের আলোকে তার যে কোনো পরিবর্তন হয়নি তাও নয়। মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে নারী সম্পর্কিত আইনের মধ্যেও তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। পরিবর্তনের এই ঐতিহাসিক ধারা থেকে প্রচলিত মুসলিম সমাজ যে নিজেদের বিযুক্ত রেখেছে তাও নজরুল লক্ষ্য করেছেন গভীর বেদনার সংগে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়টাকে চেষ্টা করেছেন জাতিবাহী করার। সিরাজগঞ্জের ঐ সম্মেলনেই এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

বাঙালি মুসলিম সমাজ ও নজরুলের প্রতিক্রিয়া

“কন্যাকে পুত্রের মতোই শিক্ষা দেয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ, তাহা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদেব শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চির বন্দি করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শতবর্ষের অভ্যাচারে ইহাদের দেহমন এমনি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহাদেরই সর্বপ্রথম বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। ইহাদের কি দুঃখ, কিসের যে অভাব, তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উঠিয়া গিয়াছে। আমরা মুসলমান বলিয়া ফখর কবি, অপচ জানি না সর্বপ্রথম মুসলমান নর নহে-নারী।”

১৯৪৩ সালে ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে নজরুল যে সভাপতির ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতেও প্রতিকলিত হয়েছিল একই বক্তব্য :

“তোমার অনাগত যুগের মশাল সর্দার--তোমাদের অর্ধেক আসন ছেড়ে দাও কল্যাণী নারীকে। দূর করে দাও তাদের সামনের ঐ অসুন্দর চটের পর্দা--যে পর্দার কুশীতা মুসলিম জাহানের কোথাও নেই। দেখবে তোমাদের কর্তব্যের কঠোরতা, জীবন পথের দুরূহগম্যতা হয়ে উঠবে সুন্দরের স্পর্শে পুষ্পপেলব। কর্মে, পাবে প্রেরণা, মনে পাবে সুন্দরের স্পর্শ, কল্যাণের ইন্দ্রিত। সম্মান দেওয়ার নামে আমরা এতদিন আমাদের মাতা ভগিনী কন্যা জায়াদের যে অপমান করেছি, আতো তার প্রায়শ্চিত্ত যদি না করি, তবে কোনো জন্মে এ জাতির আর মুক্তি হবে না।”

শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত বিঃবা বিজ্ঞানচর্চায় বাঙালি মুসলমানের উপস্থিতিহীনতা নজরুলের নজর এড়িয়ে যায়নি। কেননা এটি সভ্য কথা যে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতাই একটি জনগোষ্ঠীকে হীনবল করতে পারে না যদি তার নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে। শিল্প সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্রকলা, তার সংস্কৃতির একটা পরিমাপক মাত্রা। তাছাড়া শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্রকলার ভেতর দিয়ে একটি জাতির চিরন্তন প্রাণ প্রবাহের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। তার বিজ্ঞানমনস্কতার মধ্য দিয়ে সূচিত হয় প্রগতির জয়যাত্রা। এই মৌল বিষয়টি উপলব্ধি করেই নজরুল বলেছেন,

“আজ বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে একজন চিত্রশিল্পী নাই, ভাস্কর নাই, সঙ্গীতজ্ঞ নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি আছে? এই সবে যাহারা জন্মগত প্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল, আমাদের গোড়া সমাজ তাহাদের টুটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। এই অভ্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া বৃষ্টিতে হইবে নতুবা আর্টে বাঙ্গালী মুসলমানের দান বলিয়া কেনো কিছু থাকিবে না।”^২

শুধুমাত্র এটুকু পর্যন্ত বলেই নজরুল ক্ষান্ত হননি। তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে-

“পুত্র মত সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া আমাদের বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি, যদি আমাদের গৌরব করিবার কিছু না থাকে। ভিতরের দিকে আমরা যত মরিতেছি, বাহিরের দিকে তত সংখ্যায় বাড়িয়া চলিয়াছি। এক মাঠ আগাছা অপেক্ষা একটা মহীৰুহ অনেক বড়-শ্রেষ্ঠ।”^৩

১৩৪৩ সালে ফরিদপুর মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণেও তিনি ঐ একই কথাই বলেন :

সাহিত্যিকী

“এ বাংলায় নাকি শতবরা পঞ্চান্নজন মুসলমান। কিন্তু এই গুণতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়া এই পঞ্চান্নজনকে নিয়ে বাংলার সভাকার গৌরব করবার কতটুকু আছে, তা হিসাব করতে গেলে মনে হয়--আমরা শতবরা পাঁচজন হলেই এ লঙ্কার হাত থেকে বেঁচে যেতাম”।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোনো দেশে কোনো সমাজেই কোনো ধর্মীয় কিংবা শাস্ত্রশাসন শিল্পকলা কিংবা ললিতকলা চর্চাকে রুদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মুসলমানদের ক্ষেত্রেও দেখি ইসলামের প্রাথমিক কঠোরতার কাল কাটিয়া উঠবার পর পরই এই শিল্পকলা চর্চার সূত্রপাত ঘটেছে। বিশেষ করে ইরান থেকে এর সূচনা। এ বিষয়ে অনেকেই একমত যে, প্রাক-ইসলামী যুগের যে সুনিপুণ ঐতিহ্য পারসিকদের ছিল, তার অনেক কিছুই ইসলামের মৌলনীতির সঙ্গে সংঙ্গতিপূর্ণ না হলেও তারা তা বর্জন করতে পারেনি। চিত্রকলা, স্থাপত্য কিংবা সঙ্গীত সম্পর্কে এ কথা বলা যায়। পারসিকরা তাদের মাতৃভাষার চর্চাও অব্যাহত রাখে। আরো যেটি লক্ষ্য করবার বিষয়, তাহলো ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি ও পারিবারিক খেলাফতের যুগে কিংবা অন্যান্য মুসলিম নরপতি ও রাজবংশের আমলে নৃত্য গীতের প্রচলন ঘটে বহুলভাবে। অনেক মুসলমান নরপতিও ব্যক্তিগতভাবে নর্তকী ও গায়ক গায়িকাদের অনুরক্ত ছিলেন। চিত্রকলা ও স্থাপত্য সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। তুর্কী আফগান মোগল পাঠান প্রভৃতি মুসলমানদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষেও এর অন্যথা ঘটে না। একবারে অষ্টাদশ কিংবা ঊনবিংশ শতাব্দীতেও যে এদেশে বাইজি-কালচারের সুবিপুল বিস্তৃতি ছিল, তাতে ঐতিহাসিকভাবে সত্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে বাঙালি মুসলমান সমাজে নৃত্যগীত চিত্রকলা কিংবা অন্যান্য ললিত কলা চর্চায় যে ধর্মীয় বিধিনিষেধ আসে, তাতে একটু আশ্চর্যই হতে হয়। হতে পারে ওহাবীর মতো শুদ্ধতাবাদী আন্দোলনের ফল ছিল এটা। যাহোক, শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধিনিষেধ যে গ্রহণযোগ্য নয়, এ ব্যাপারে নজরুলের ধারণা ছিল দৃঢ়। সার্বিক উন্নতির জন্যই এর প্রয়োজন রয়েছে যে সম্পর্কেও তিনি ছিলেন নিশ্চিত।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির প্রকাশও তিনি লক্ষ্য করেছেন। জীবনকে মহৎ ও গৌরবান্বিত করার বদলে মুসলিম তরুণেরা ছাপোষা মানুষ হয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেই যে আগ্রহী তাও তাঁকে পীড়া দিয়েছে। মুসলিম তরুণদের শিক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

“আমাদের মুসলমান তরুণেরা লেখাপড়া করে জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, চাকুরী অর্জনের জন্য। গাধার ‘ফিউচার প্রসপেক্টের’ মত আমরা ঐ চাকুরীর দিকে তীর্ধের কাকের মত হা করিয়া চাহিয়া আছি। বি.এ.এম. এ পাশ করিয়া যদি কিছুই না হই অস্ত্রতঃ সাবরেজিষ্টার বা দারোগা হইবই, এই যাহাদের লক্ষ্য, এত স্বল্প যাহাদের আশা, এত নিম্ন যাহাদের গতি, তাহাদের কি আর মুক্তি আছে ? এই ভূত না ছাড়িয়া গেলে আমরা যে ভিমিরে সেই ভিমিরেই থাকিব।”^৭

বহুত নজরুলের উপরোক্ত পর্যবেক্ষণও সঠিক বলেই মনে হয়। কেননা ঐতিহাসিকভাবেও এটা সত্য যে মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের একটা আপাতঃ তাকিদ ছিল। সেটা এসেছিল মূলতঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠাহীনতা আর প্রশাসনিক কাজকর্মে

বাঙালি মুসলিম সমাজ ও নজরুলের প্রতিক্রিয়া

নিজেদের স্থান না থাকা। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ তথা সাদা অর্থেই প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি লাভ দ্বারা তাদের এই অভাব পূরণের বিকল্পহীন সুযোগ ছিল। প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের তুলনায় বিশেষ করে চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে সংখ্যান্বতাকে তারা বিবেচনা করেছিল সমাজের অনগ্রসরতার একটা প্রধান কারণ হিসেবে। শিক্ষার দ্বারা নিজেদের চিত্তকে আলোকিত করা, দৃষ্টিভঙ্গীকে বৈজ্ঞানিক কিংবা জীবনে মহত্ববোধ জাগ্রত করা- এই বিষয়গুলোকে তারা মূখ্য বলে বিবেচনা করেনি। তা যদি করত তবে বলা যায়, অন্ততঃ যে বুর্জোয়া শিক্ষার ভেতর দিয়ে তাঁরা শিক্ষিত হয়েছিল, তাতে আর যাই হোক, সে শিক্ষা তাদেরকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিস্তারে এতো উগ্র করে তুলতো না।

বাঙালি মুসলমান সমাজে মাতৃভাষার চর্চাকে নজরুল অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন। কেননা, এটা সত্যি যে বাঙালি মুসলিম সমাজ মাতৃভাষা বাংলা চর্চার ব্যাপারে ছিল দ্বিধাবিভক্ত। তার প্রধান কারণ হলো, ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে, বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় অন্তিমকাল পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানেরা ছিল সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠাহীন। গণনীয় মুসলমান বলতে তখন এদেশে যারদকে বোঝাতো, তারা সবাই ছিল অবাঙালি। সাধারণভাবে এ সমস্ত অবাঙালি মুসলিম পরিবারের ধর্মীয় ভাষা আরবী, কালচারের ভাষা ফারসী ও মাতৃভাষা উর্দু চলছিল। প্রধানতঃ তাদের কারণেই এই তিনটি ভাষা মুসলমানদের ভাষা কিংবা ইসলামী ভাষা নামে পরিচিত হয়। এ সব ভাষা সম্পর্কে বাঙালি মুসলমানের মনে এক ধরনের মিথেরও জন্ম দেয়। এখন ভাষার যে কোনো ধর্মীয় পরিচয় নেই...এই সত্য নজরুলের কালতো দূরের কথা, বর্তমানকালেও ঠিক বোঝানো যাচ্ছে না। আরবী, ফারসী-দুটাই ছিল কাফেরদের ভাষা। পবিত্র কোরআন শরীফ আরবীতে নাজিল হওয়ার পর কিংবা পারস্যবাসী ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর এগুলো হয়ে গেলো ইসলামী ভাষা। পাশাপাশি বাঙ্গালিরা যখন ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তাদের ভাষা বাংলা কিন্তু পরিণত হলো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অপাংক্তেয়। এই সব কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন প্রধানত অবাঙালি মুসলমানদের দ্বারা মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলন শুরু হয়, তখন আরবী, ফারসী, উর্দু এসব ভাষা ইসলামী বলে সবক' এলো। এর পরিপ্রেক্ষিতে এক শ্রেণীর বাঙালি মুসলমানও প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে লাগলো ঐসব ভাষার চোস্ত জবান আয়ত্ত করতে। বাঙালি মুসলমান আবদুল লতিফ সাহেব, যাকে ইংরেজ শাসকেরা নবাব উপাধিতে ভূষিত করেছিল, তিনি তো লিখেই বসলেন, বাংলা নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের ভাষা। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের ভাষা যে কি, তা কি বলে দেবার? যাহোক, বাংলা ভাষাকে বাঙালি মুসলমানের মুখ থেকে এখনো বিতাড়িত করা সম্ভব হয়নি। তবে বর্তমান বাংলাদেশেও মৌলবাদী ষড়যন্ত্র অব্যাহত আছে তাকে যথাযথ ইসলামী (?) বানানোর বাসনায়।

মাতৃভাষা বাংলার প্রশ্নে একটি ধর্মীয় ও স্বার্থান্বেষী মহলের অপচেষ্টার বিরুদ্ধেই নজরুল কথা বলেছেন। মাতৃভাষা চর্চার জন্য একটি কেন্দ্রও গড়ে তোলার সুপারিশ করেছেন। একটি উদ্ভৃতি থেকে বিষয়টি বোধকরি পরিষ্কার হতে পারেঃ

“যদি পারেন, মাতৃভাষায় আপনাদের সাহিত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ইতিহাস সভ্যতার অনুবাদ ও অনুশীলনের কেন্দ্রভূমি যেখানে হোক প্রতিষ্ঠা করুন। তা না পারলে অনর্থক ধর্ম ধর্ম বলে চিৎকার করবেন না।”

সাহিত্যিকী

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে বাংলাকে কেবল হিন্দুর ভাষা বলার অপপ্রচার নজরুলের কাল থেকেই শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে প্রিন্সিপাল ইবরাহিম খাঁকে লেখা পূর্বোক্ত পত্রে তিনি বলেন :

“বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির দুহিতা না হলেও পালিতা বন্যা। কাজেই তাতে হিন্দুর ভাবধারা এতই ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে তাকে বাদ দিলে বাংলা ভাষার অর্ধেক ফোর্স নষ্ট হয়ে যাবে। ইংরেজী সাহিত্য হতে গ্রীক পুরাণের ভাব বাদ দেওয়ার কথা কেউ ভাবতে পারে না। বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেবদেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায্য, তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে তুরু কোঁচকানো অন্যায্য। আমি হিন্দু মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি বা হিন্দু দেবদেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্যহানি হয়েছে। তবু আমি জেনে শুনেই তা করেছি।”

যাহোক সবকিছু মিলে শাস্ত্রাচারে বদ্ধ অনুদার সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণু বাঙালি মুসলিম সমাজের যে রূপের কথা নজরুল লিখিতভাবে উল্লেখ করেছেন সন্দেহ নেই, তা ছিল যথার্থ। সর্বোপরি এ বিষয়ে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, তাতে ফুটে উঠেছে তাঁর নিজস্ব মানস-বৈশিষ্ট্য। তাঁর এই বৈশিষ্ট্য ছিল একান্তভাবেই মানবিক.. যা কোনো বিশেষ ধর্ম-বর্ণ বা দেশ ও কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। মোটামুটিভাবে এই শতাব্দীর তিরিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। বলাবাহুল্য, এ সময়টা পর্যন্তই ছিল নজরুলের জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির কাল। এই সময় পর্যন্তই তিনি ছিলেন দেহ ও মনে একান্তভাবে সুস্থ ও সচেতন। এরপরও বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বাঙালি মুসলমান সমাজ সম্পর্কে নজরুল তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। যেমন ১৩৪৭ সালে কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি ঈদ সম্মেলনে কিংবা ১৯৪০ সালে কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনে কিংবা ১৯৪১ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জুবিলি উৎসবে সভাপতিরূপে তাঁর জীবনের শেষ ভাষণে। যথার্থ অর্থে এগুলোর ভেতর দিয়ে সমাজ পর্যবেক্ষণ খুব একটা ঘটেনি। তার বদলে এসেছে অধ্যাবৃত্ততার উপলব্ধি। কিন্তু এই উপলব্ধি যে বিশেষ কোনো ধর্ম দ্বারা উদ্ভূত হয়েছে, তা মনে হয় না। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলো লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যাবেঃ

১। “আদ্যাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। প্রকাণ্ড তার সৃষ্টি। সে সৃষ্টির পশ্চাদভূমিতেই জন্ম নিয়েছে চন্দ্র সূর্য তারকার সৃষ্টির ঐশ্বর্য। এই বৃহৎকে বুঝবার সাধনাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এ জন্য চাই সেই মুক্ত বিরাট জীবন।”^{১১}

২। “আমি সর্ববন্ধন মুক্ত, সংস্কার মুক্ত, সর্বভেদাভেদ জ্ঞানশূন্য না হলে - সেই পরম নিরাবরণ, পরমমুক্ত আদ্যাহকে পাব না আমার শক্তিতে।”^{১২}

৩। “যার ইচ্ছায় আজ দেহের মাঝে দেহাতীতের নিভামধুর রূপদর্শন করেছি...তিনি যদি আমার সর্ব অস্তিত্ব গ্রহণ করে আমার আনন্দময়ী শক্তিকে ফিরিয়ে দেন, সেই শক্তির চোখে

বাঙালি মুসলিম সমাজ ও নজরুলের প্রতিক্রিয়া

আবার যদি বন্যা বয়, তার আগে যদি আবার অমৃত বসুধারা প্রবাহিত হয়, আবার যদি তার চরণে রাস-নৃত্যের ছন্দ জাগে-তাহলে আমি এই বিদেশে জর্জরিত দুঃসিত সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞানবশুণিত অসুর নিপীড়িত পৃথিবীকে সুন্দর করে যাব: এই তৃষিতা পৃথিবী বহুকাল যে প্রেম, যে অমৃত যে আনন্দ, যে রসধারা পেকে বহিষ্ঠ, সেই আনন্দ সেই প্রেম আবার সে পাবে।”^{২২}

৪। “আজ আমার মনে হয়, এই নিত্য পরমানন্দময়ী পরম প্রেমময়ী পরম শ্রী-ই আমার অস্তিত্ব আমার শক্তি। নিরাকার নির্গুণঅবাণমানসগোচর ব্রহ্ম যেমন তার শক্তির অশ্রয় তিষ্ঠা করেন সৃষ্টির রূপে, গুণে প্রতিভাত হন বা মনের গোচর হন, এই প্রেমশক্তির অশ্রয় পেয়ে আমি তেমনি আবার আমার সৃষ্টিতে যেন ফিরে আসছি।....এই পরম-নিত্য প্রেমশক্তিকে পেয়েই আমি পরম নিত্যম আমার Eternal existence কে পেলাম।”^{২৩}

৫। “আমার মন্ত...“ইয়াকা নাবুদু ইয়াকা নাস্তাইন”। কেবল এক আল্লাহর আমি দাস। অন্য কারুর দাসত্ব স্বীকার করি না, একমাত্র তারই কাছে শক্তি ভিক্ষা করি। আমি ফকীর আল্লাহুর দরবারে আজ আমি পরম ভিক্ষু; যদি তাঁর কাছে রহমত ও শক্তি ভিক্ষা পাই...ইনশাআল্লাহ, শুধু ভারত কেন সারা দুনিয়াময় সভ্যতার ডংকা বেজে উঠবে তৌহিদের পরম অদ্বৈতবাদের অমৃত বন্যা বয়ে যাবে। এই অদ্বৈতবাদেই সারা বিশ্বের মানব এসে মিলিত হবে।....কত হিটলার কত কামাল আপনাদের মাঝে লুকিয়ে আছেন, তা আপনারা জানেন না, কিন্তু আল্লা আমায় তাদের স্বরূপ দেখিয়েছেন।”^{২৪}

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জীবনের এই পর্বেই নজরুল তাঁর মৃত পুত্র দর্শনের মতো অব্যস্তব ঘটনারও বর্ণনা দিয়েছেন পরম বিশ্বাসের সঙ্গে। শ্রী বরদাচরণ মজুমদার প্রণীত ‘পথ হবার পথ’ গ্রন্থের আলোচনাকালে তিনি লিখেছেন....

“কিছুদিন পরে যখন আমি আমার পথ খুঁজিভেছি, তখন আমার প্রিয়তম পুত্র সেই পথের ইঙ্গিত দেখাইয়া আমার হাত পিছলাইয়া মুক্তার সাগরে হারাইয়া গেল। মৃত্যু এই প্রথম আমার ধর্মরাজরূপে দেখা দিলেন। সেই মৃত্যুর পক্ষান্তে আমার অন্তরাজ্য নিশিদিন ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। আমার হাত ধরিয়া তাহারই কাছে লইয়া গেলেন যাহাকে নিম্নতম গ্রামে বিবাহ সভায় দেখিয়াছিলাম; ধ্যান বসিয়া অবিস্টের মত তাঁকে বাইশবার প্রদক্ষিণ করিলাম। ধর্মরাজ আমার পুত্রকে শেষবার দেখাইয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন।”

এই সময়ে তিনি “দেবীস্তুতি” কিংবা “দশমহাবিদ্যা” নামক গ্রন্থগুলো রচনা করেন। স্পষ্টতই দেখা যায়, এই পর্যায়ে এসে নজরুলের সামাজিক কমিটমেন্ট ও সচেতনতা অসংলগ্ন হয়ে পড়েছিল।

এসব সত্ত্বেও নজরুল তাঁর সমকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজের ক্রটি বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতাকে যেভাবে চিহ্নিত করেছিলেন, তা ছিল ধর্মাত্ম সমাজের কেউকেটাদের জন্য নিদারুণ আঘাতস্বরূপ। রক্ষণশীল ধর্মীয় সমাজের ভেতরে যে মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতির সূত্রপাত ঘটেছিল তাতে নজরুলের এই ভূমিকাও বাক্য করেছিল প্রবলভাবে। কিন্তু পরবর্তীকালে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার শুরু হওয়ার পর সমাজের চেহারা পালটে যাওয়ার বদলে তা আরো ধর্মনির্ভর, অনুদার ও সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়ে। পাবিন্তানের

সাহিত্যিকী

প্রতিষ্ঠা (১৯৪৭) ও বাংলাদেশের সংবিধানের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বদল ধর্মের এই রাজনৈতিক ব্যবহারের ফলমাত্র। এতে করে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা পেয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। জীবনে-সমাজে-রাষ্ট্রে-পরিবারে মানবিক ও যৌক্তিক আচরণ হচ্ছে অস্বীকৃত। শিল্প-সাহিত্য গড়ে তোলা হচ্ছে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার ছাঁচে এবং সর্বোপরি মানুষের পরিচয়ই হয়ে দাঁড়াচ্ছে ধর্মভিত্তিক। আর ধর্মের এই একই লেবাস সেঁটে দেওয়া হচ্ছে নজরুলের গায়ে।

তথ্য সূত্র :

১. ভদ্র, ১৩২৭
২. কালের পুতুল, এন্ড সংস্করণ, ১৯৫৯
৩. ১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলিকাতা এ্যালবার্ট হলে নজরুল সঙ্ঘর্ষনা সমিতির সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত মানপত্রের প্রতিভাষন।
৪. ১৯৪০ সালের ২৩ ডিসেম্বর কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে ভাষণ।
৫. সভাপতির ভাষণ বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলন, সিরাজগঞ্জ ৫ ও ৬ নভেম্বর ১৯৩২
৬. এ
৭. এ
৮. এ
৯. ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নজরুল কর্তৃক সভাপতির ভাষণ।
১০. ১৩৪৭ সালে বাঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ঈদ-উৎসবে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ
১১. ১৯৪০ সালে কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ
১২. ১৯৪১ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রক্তত ছুঁবিধী উৎসবে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।
১৩. ১৯৪১ সালের ১৬ মার্চ বনগাঁ সাহিত্য সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।
১৪. ১৯৪০ সালের ২১ ডিসেম্বর কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য করে প্রেরিত বাণী।